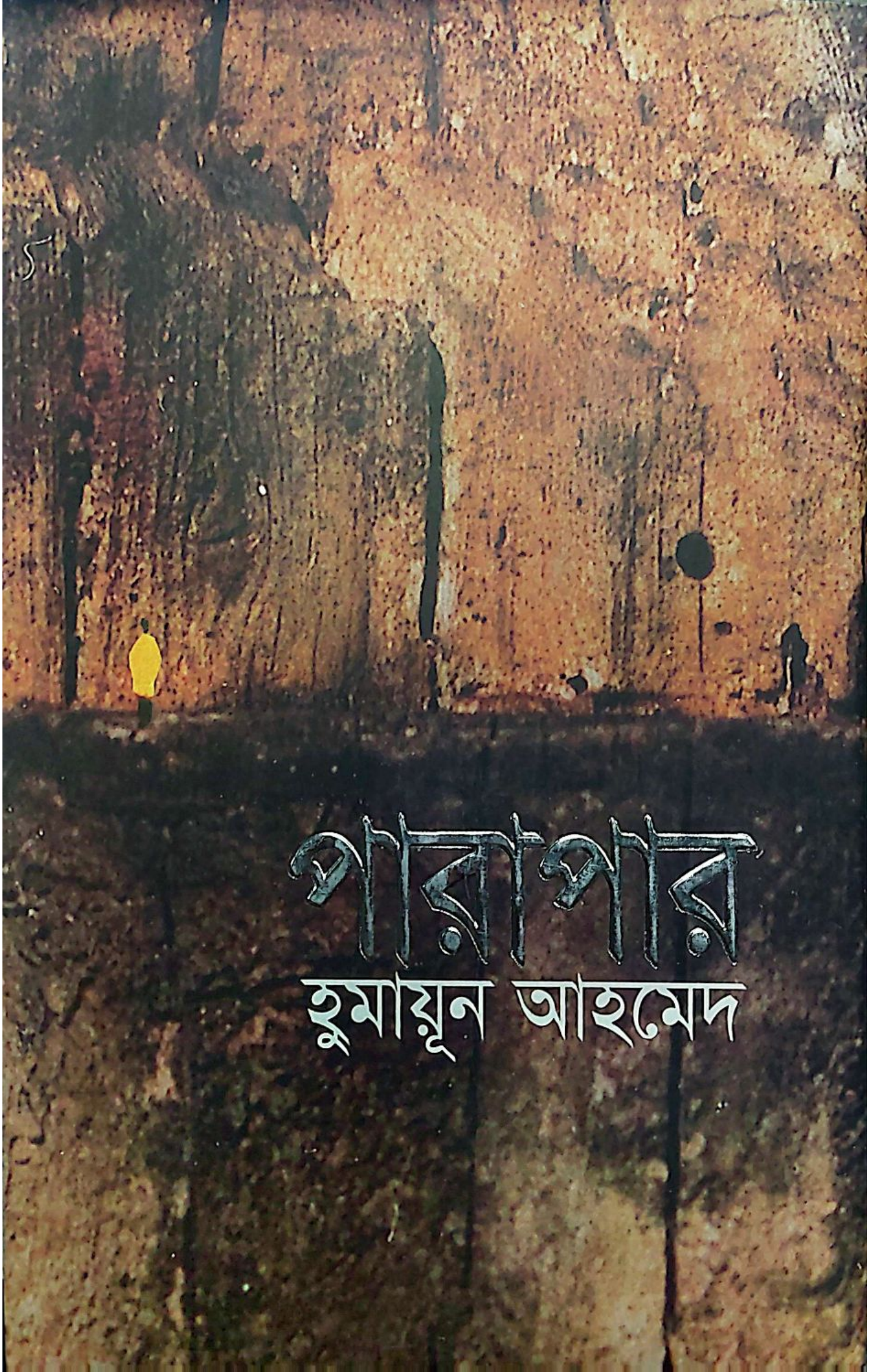
পায়পার
হুমায়ূন আহমেদ

কাল সারারাত ঘুম হয় নি।

ঘুম না হবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘুমোতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখভর্তি ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখে। আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছেন, এই হিমু, হিমু, ওঠ। তাড়াতাড়ি ওঠ। ভূমিকম্প হচ্ছে। ধরণী কাঁপছে।

আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম, আহ,. কেন বিরক্ত করছ ?

বাবা ভরাট গলায় বললেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মজার ব্যাপার আর হয় না। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই সময় চোখকান খোলা রাখতে হয়। তুই বেকুবের মতো শুয়ে আছিস।

ঘুমোতে দাও বাবা।

তোর ঘুমোলে চলবে না। মহাপুরুষদের সবকিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধারণ মানুষ ঘুমায়— অসাধারণরা জেগে থাকে।...

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :: ধ্রুব এষ

ঢাকা শহরে ঘুঘুর ডাক শোনার কথা না।

কেউ কোনোদিন শুনেছে বলেও শুনি নি। ঘুঘু শহর পছন্দ করে না, লোকজন পছন্দ করে না। তাদের পছন্দ গ্রামের শান্ত দুপুর। তারপরেও কী যে হয়েছে— আমি ঘুঘুর ডাক শুনছি। বাংলাবাজার যাচ্ছিলাম, গুলিস্তানে ট্রাফিক জ্যামে পড়লাম। রিকশা, টেম্পো, বাস, ঠেলাগাড়ি সবকিছু মিলিয়ে দেখতে দেখতে জট পাকিয়ে গেল। এক্কেবারে কঠিন গিট্টু। হতাশ হয়ে রিকশায় বসে আছি আর ভাবছি— আধুনিক মানুষের একজোড়া পাখা থাকলে ভালো হতো। জটিল ট্রাফিক জ্যামের সময় তারা উড়ে যেতে পারত। ঠিক এই রকম হতাশা-জর্জরিত সময়ে ঘুঘু পাখির ডাক শুনলাম। সেই অতি পরিচিত শান্ত বিলম্বিত টানা-টানা সুর, যা শুনলে মুহূর্তের মধ্যে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষের শরীরের ভেতরে যে আরেকটি শরীর আছে তার মধ্যে কাঁপন ধরে।

আমি হতচকিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকালাম। এমন কি হতে পারে যে কেউ খাঁচায় করে পাখি নিয়ে যাচ্ছে, সেই পাখি ডেকে উঠল ? ইদানীং ঢাকার লোকদের পাখি-পোষা অভ্যাসে ধরেছে। নীলক্ষেতে বিরাট পাখির বাজার।

ট্রাফিক জট কমছে না। জট কমানোর চেষ্টাও কেউ করছে না। রোগা ধরনের এক ট্রাফিক পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে বাদামওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। এখানে যে কঠিন অবস্থা তা সে জানে বলেও মনে হচ্ছে না। এই তো দেখি সে বাদাম কিনছে। এক ঠোঙা বাদাম, একটু ঝাল লবণ।

যতই সময় যাচ্ছে অবস্থা জটিল হয়ে আসছে। সবাই কিন্তু নির্বিকার— 'যা হবার হোক' এমন এক ভঙ্গি। কারো মধ্যেই কোনো অস্থিরতা নেই। আমার রিকশা ঘেঁসে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে। মাইক্রোবাসের পর্দা টেনে দেয়া। ভেতরের যাত্রীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে শুধু দেখছি। মনে হলো সে খুব মজা পাচ্ছে। একবার সে উঁচু গলায় বলল, লাগছে গিট্টু।

চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। আশ্বিন মাসে খুব ঝাঁজালো রোদ ওঠে। বাতাস থাকে মধুর। আজ বাতাস নেই, শুধুই রোদ। রোদের সঙ্গে ঘামের গন্ধ, ঘামের গন্ধের সঙ্গে পেট্রোলের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে ঘুঘুর ডাক ঘু-ঘু-ঘু। মিলছে না একেবারেই মিলছে না। Something is wrong. আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, পাখি ডাকছে নাকি ?

আমার রিকশাওয়ালা বিরক্তমুখে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ ঘুঘু ডাকছে না। কিংবা ডাকলেও সে শুনছে না। সবাই সবকিছু শুনতে পায় না। তাছাড়া রাস্তায় যারা জীবনযাপন করে গাড়ির হর্ন শুনতে শুনতে তাদের কান নষ্ট হয়ে যায়।

মাইক্রোবাসের পর্দা সরে গেল। একজন পান-খাওয়া মহিলা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। ভদ্রমহিলার সিঁথির চুল পাকা। এছাড়া তাঁর মুখে বয়সের কোনো চিহ্ন নেই। চুল পাকা না থাকলে অনায়াসে তাঁকে ৩০/৩২ বছরের তরুণী বলে চালানো যেত। তিনি জানালার পর্দা সরিয়েছেন পানের পিক ফেলার জন্যে। অনেকখানি মাথা বের করে একগাদা পানের পিক ফেলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই হিমু না ?

আমি জবাব দিলাম না, কারণ ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারছি না। আমার অতি দূরের কোনো আত্মীয় হবেন। মেয়েরা অতি দূরের আত্মীয়কে কাছের মানুষ প্রমাণ করার জন্যে চট করে তুই বলে।

কী রে, কথা বলছিস না কেন ? তুই কি হিমু ?

হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারছিস ?

না।

আমি আলেয়া খালা। এখন চিনেছিস ?

আলেয়া নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ল না। একজন আলেয়াকেই চিনতাম, সে *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকের নর্তকী। সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর আম্রকাননে তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ যাত্রার আগে আলেয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন, আলেয়া তখন গান ধরল— 'পথহারা পাখি, কেঁদে ফিরে একা'।

হিমু, তুই এখানে কী করছিস ?

রিকশার সিটের উপর বসে আছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছিস কোথায় ?

যখন রিকশায় উঠেছিলাম, তখন একটা গন্তব্য ছিল। এখন নিজেও ভুলে গেছি।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস কেন ? আমি তোর খালা না ? আয়, উঠে আয়।

কোথায় উঠে আসব ?

বাসে উঠে আয়। গরমে সিদ্ধ হবি না কি ? তুই যেখানে যাবি, নামিয়ে দেব। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে উঠে আয়।

আমি কথা বাড়ালাম না। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালাকে দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে। অপমানিত বোধ করারই কথা, তার রিকশাকে ছোট করা হয়েছে।

মাইক্রোবাসে ঢুকে মনে হলো— ছোটখাটো একটা চলন্ত বেহেশতে ঢুকে পড়েছি। এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার চালু আছে। শীত-শীত ভাব। মাইক্রোবাসটার ছাদের একটা অংশ কাচের। ভেতরে বসে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ছয়জনের বসার জায়গা। প্রতিটি সিট আলাদা। সিটগুলো ঘূর্ণায়মান। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরানো যায়। ভদ্রমহিলা একা যাচ্ছেন না। তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে, চেহারা দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে, তবে চেহারা পুরো দেখা যাচ্ছে না, গাঢ় সানগ্লাসে মুখের পুরোটাই প্রায় ঢাকা। মেয়েটির কোলের উপর একটা বই। সানগ্লাস পরে এর আগে আমি কাউকে পড়তে দেখি নি। ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে আগ্রহ নিয়ে বললেন, ও খুকি, এ হচ্ছে হিমু। খুব ভালো হাত দেখতে পারে। হাত দেখাবি ?

খুকি কোনোরকম উৎসাহ দেখানো দূরে থাকুক, বই থেকে চোখ পর্যন্ত তুলল না। এটা বড় ধরনের অভদ্রতা। তবে রূপবতীদের সব অভদ্রতা ক্ষমা করা যায়। এরা অভদ্র হবে এটাই স্বাভাবিক। এরা ভদ্র হলে অস্বস্তি লাগে।

কী রে খুকি, হাত দেখাবি ? বসেই তো আছিস। দেখা না। হিমু চট করে দেখে ফেলবে।

খুকি বরফশীতল গলায় বলল, কেন বিরক্ত করছ ?

আলেয়া খালা নিজের হাত বাড়িয়ে বললেন, হিমু, আমার হাতটা দেখে দে তো। মন দিয়ে দেখবি।

খুকি চোখ তুলে এক পলকের জন্যে মার মুখ দেখে আবার বই পড়তে শুরু করল। এই এক পলকের দৃষ্টিতেই তার মার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কালো চশমার কারণে হয়তো ভস্ম হলেন না।